আমার দেশ আমার মেধা

মোস্তাফা জব্বার

বাংলাদেশের মানুষের একটি গর্বের বিষয় হচ্ছে, আমরা নিজের অর্থে পদ্মা সেতু বানাচ্ছি। মিথ্যা দুর্নীতির অজুহাতে বিশ্বব্যাংক যখন এই সেতু প্রকল্প থেকে সরে দাঁড়ায়, সাথে যখন অন্যরাও যোগ দেয়, তখন সারা দুনিয়াই ধরে নিয়েছিল, যে আমাদের স্বপ্নের সেতু বুঝি আর হলো না। কিন্তু আমরা প্রমাণ করলাম, বিশ্বব্যাংক নয়, যেকেউ সরে দাঁড়ালেও বাংলাদেশ তার নিজের স্বপ্ন পূরণ করতে পারে। তার সন্তানদের মেধাই তার দেশের জন্য যথেষ্ট। ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা আমাদের সাহসী নেত্রী প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে। তিনি যদি এই সময়ে দেশটির নেতৃত্ব না দিতেন, তবে হয়তো এমনটি হতো না। ১৯৭২ সালে হেনরি কিসিঞ্জার যে বাংলাদেশকে তলাবিহীন ঝুড়ির দেশ বলেছিলেন, সেটিরও দাঁতভাঙা জবাব দিলাম আমরা এই পদ্মা সেতু বানিয়ে। এজন্য মার্কিন প্রেসিডেন্ট বারাক ওবামা কেনিয়ায় গিয়ে বাংলাদেশ থেকে শিক্ষা নেয়ার কথা বলেছেন। একইভাবে ডিজিটাল বাংলাদেশ ঘোষণাকে অনুসরণ করে ভারত ডিজিটাল ইন্ডিয়া ঘোষণা দিলো মোদী নিজে বাংলাদেশকে অনুসরণ করার ঘোষণা দিলেন। সেই অনুষঙ্গকে মাথায় রেখেই আমাদের নিজেদেরকে ও বিশ্ববাসীকে জানাতে চাই, ১৯৬৪ সালে এই দেশে দক্ষিণ এশিয়ার প্রথম কমপিউটার এসেছিল এবং আমরা পদ্মা সেতু বানাবার বহু আগে সুইডেনের ভলবোর জন্য বাংলাদেশ থেকে সফটওয়্যার বানিয়ে দিয়েছি। আমরা শুধু দক্ষিণ এশিয়ার প্রথম কমপিউটার প্রোগ্রামার মো: হানিফউদ্দিন মিয়ার উত্তরসূরি নই, আমরা এখন বিশ্বের ১৮০টি দেশে সফটওয়্যার ও সেবা রফতানি করি। আমাদের এখন নিজের দেশের নজর দেয়ার সময় হয়েছে। আমরা বিদেশি যেকোনো প্রতিষ্ঠানের সমকক্ষ বা উন্নত মানের সফটওয়্যার বানাতে পারি। অনুগ্রহ করে গুলশানের হামলা বা শোলাকিয়ার সন্ত্রাস দেখে আমাদেরকে জঙ্গিবাদী মনে করবেন না। আমরা জঙ্গি বানাই না, প্রোগ্রামার বানাই। বাঙালিরা জঙ্গিবাদকে একাত্তরে কবর দিয়েছে। আমরা দুঃখিত যে জাপানি, ইতালীয় ও ভারতীয়দের সাথে বাংলাদেশীদের রক্ত একসাথে মিশেছে। আমরা এটাও স্মরণ করাতে চাই, আমরা জাপানের অর্থনীতিতে অবদান রাখছি। জাপানের জন্য দেশ থেকে আমাদের কমপিউটারবিদেরা যেমন কাজ করছে, তেমনি আমরা জাপানে অন্তত সাড়ে তিনশ' প্রোগ্রামার বসিয়ে জাপানিদের জন্য কাজ করছি। এমন অসংখ্য দেশের জন্য অবদান রাখার দৃষ্টান্ত আছে আমাদের। কিন্তু বাস্তবতা হচ্ছে, নিজের বাড়িতে আমাদের সেই কদর দেখছি না। একটু অন্দরের কথা বলতে চাই।

রেজা সেলিমকে আমি অনেক স্নেহ করি। ওর মতো লড়াকু মানুষ সচরাচর চোখে পড়ে না। এমন প্রযুক্তিমনস্ক মানুষ এবং তৃণমূলের সাথে তথ্যপ্রযুক্তিকে সম্পৃক্ত করার মতো যোদ্ধাও বিরল। বাগেরহাটে প্রযুক্তি ব্যবহার করে সাধারণ মানুষের জীবন পাল্টে দিতে সে অসাধারণ কাজ করেছে। তথ্যপ্রযুক্তি ব্যবহার করে গ্রামের নারীদের ক্যান্সারের চিকিৎসা, ছাত্রছাত্রী ও সাধারণ মানুষের জন্য তথ্যপ্রযুক্তি শিক্ষা বা শিশুদের জন্য ডিজিটাল শিক্ষার আয়োজনে রেজার অবদানের খবর দেশের অনেকেই রাখেন না। আমিও হয়তো পুরোটা জানি না। তবে ওর ডাকে আমি খুলনা-বাগেরহাট-রামপাল-শ্রীফলতলা ঘুরেছি বহুবার। সেই রেজা সেলিম গত ৩০ জুন আমাকে একটি মেইল পাঠিয়েছিল। সেদিনই সরকারের টেলিকম বিভাগ মাইক্রোসফটের সাথে একটি সমঝোতা স্মারক সই করেছে, দেশের ডিজিটাল নিরাপত্তা বিষয়ে। রেজা সেলিম সেই প্রসঙ্গে কিছু কথা বলেছে। তার মেইলটি পাঠ করার আগে আমি স্মরণ করতে পারি গত ২৫ জুন অনুষ্ঠিত বেসিস (বাংলাদেশ অ্যাসোসিয়েশন অব সফটওয়্যার অ্যান্ড ইনফরমেশন সার্ভিসেস) নির্বাচনে আমার নেতৃত্বাধীন ডিজিটাল ব্রিগেড প্যানেলে আমরা স্লোগান দিয়েছিলাম– দেশের পক্ষে, দেশের সফটওয়্যার ও সেবা খাতের পক্ষে। সেই নির্বাচন সমাপ্ত হওয়ার পর আমাদের নিজেদের কাছে দেশের সফটওয়্যার ও সেবা খাতের মানুষেরা কী ভাবেন, তার একটি দিক-নির্দেশনা পৌঁছেছে। বেসিসের ৯টি পরিচালক পদের ৭টিতে আমরা জয়ী হাওয়ায় আমরা মনে করতেই পারি, আমাদের ঘোষণার সাথে বেসিসের ভোটারেরা সংহতি প্রকাশ করেছেন। নির্বাচনের পরপরই দৈনিক বাংলাদেশ প্রতিদিনের জিন্নাতুন নুর আমার সাথে কথা বলে। যার ভিত্তিতে গত ২৯ জুন পত্রিকাটির প্রথম পৃষ্ঠায় আমার কিছু কথা প্রকাশিত হয়েছে। যদি সম্ভব হতো তবে পুরো আলোচনাটিই আমি তুলে ধরতাম। তবে সেই পরিমাণ ঠাঁই না থাকায় আমি সেখান থেকে অংশবিশেষ তুলে ধরছি।

'রফতানি বাজার দখল করতে পারাটা নিঃসন্দেহে আমাদের জন্য একটি অর্জন হবে। কিন্তু আমাদের কাছে মনে হচ্ছে, বাইরের দিকে তাকাতে গিয়ে নিজের ঘর আমি অন্যের দখলে দিয়ে দিচ্ছি। আমরা বাংলাদেশে ব্যাংকিং সফটওয়্যারের বাজার তৈরি করেছি। কিন্তু সে বাজার দখল করেছে বিদেশীরা। এভাবে প্রতিটি ক্ষেত্রেই আমরা চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি। আমাদের প্রধান চ্যালেঞ্জ হবে আমাদের দেশের বাজার ও আমাদের দেশের সফটওয়্যার বাণিজ্যে রফতানি শক্তিশালীকরণ। আমরা নিজেদের মেধা দিয়েই যেন এ বাজার সুরক্ষা করতে পারি।'

স্মরণ করিয়ে দিতে পারি, আজকের প্রধানমন্ত্রী যখন প্রথমবারের মতো দেশের প্রধানমন্ত্রী হন এবং আজকের বাণিজ্যমন্ত্রী তোফায়েল আহমেদ যখন প্রথমবারের মতো বাণিজ্যমন্ত্রী হন তখন 'হাও টু এক্সপোর্ট সফটওয়্যার ফ্রম বাংলাদেশ' নামে একটি টাস্কফোর্স গঠন করা হয়। তার নেতৃত্ব দিয়েছেন ড. জামিলুর রেজা চৌধুরী। আমি তার সদস্য ছিলাম। আমরা সরকারের কাছে ৪৫টি সুপারিশ পেশ করেছিলাম। বেসিসের জন্মও সেই প্রতিবেদনের একটি সুপারিশের ভিত্তিতে। সেই থেকে শেখ হাসিনার সরকার দেশ থেকে সফটওয়্যার রফতানি করার জন্য সহায়ক সব কাজ করে যাচ্ছে। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত রফতানির ক্ষেত্রে আমরা যা-ই করে থাকি না কেন, নিজের দেশের বাজারে আমাদের অবস্থা মোটেই ভালো নয়। জিন্নাতুন নুরের কাছে দেয়া সাক্ষাৎকারে আমি বিষয়টি স্পষ্ট করেছি। আমি বলেছি, আমাদের ডিজিটাল ব্রিগেড প্যানেলের নির্বাচনী স্লোগানের মধ্যে (আমরা দেশের পক্ষে, দেশের সফটওয়্যার ও সেবা খাতের পক্ষে) আমাদের দায়িত্ব সম্পর্কিত দিক-নির্দেশনা আছে।

'আমরা বেসিসের জন্ম থেকে আন্তর্জাতিক সফটওয়্যার মার্কেট ও সফটওয়্যার রফতানির বিষয়ে গুরুত্ব দিয়ে আসছি। এ গুরুত্ব আমরা ধরে রাখব। বাংলাদেশে এখন যে বড় কাজগুলো হচ্ছে, তা দেশীয় প্রতিষ্ঠানগুলো করতে পারছে না। এসব কাজ বিদেশী প্রতিষ্ঠানগুলো করছে। এমনকি আমাদের প্রতিষ্ঠানগুলো টেন্ডারেও অংশ নিতে পারে না। সরকার ডিজিটাল বাংলাদেশের স্লোগান দিয়ে বাংলাদেশের ১৬ কোটি মানুষের জীবনযাপন থেকে শুরু করে শিক্ষাব্যবস্থা সবকিছু ডিজিটাল করতে চায়। এই হিসেবে বিবেচনা করলে ১৬ কোটি বাংলাদেশীর বাজার ইউরোপের প্রযুক্তি বাজারের চেয়ে বড়। আর বাংলাদেশে শুধু আমরা যাত্রা করেছি। অন্যরা এ বাজার অনেকটা নিঃশেষ করে দিয়েছে। সেদিক দিয়ে আমাদের বাজার অনেক বড়। আর আমরা নিজের বাড়ির বাজার যদি সুদৃঢ় করতে পারি, তবে তা হবে আমাদের জন্য অনেক বড় অর্জন। এজন্য সরকারের নীতি ও অবকাঠামোগত ক্ষেত্রে কিছু পরিবর্তন করতে হবে। আমাদের দেশীয় প্রতিষ্ঠানগুলো যাতে সরকারি কাজ করতে পারে, সে ধরনের আইন-কানুন সংশোধন করতে হবে। আমাদের প্রতিষ্ঠানগুলোর সক্ষমতা বাড়াতে হবে। একই সাথে আমাদের যে মেধাসম্পদ আছে তার জন্য মেধা সংরক্ষণ, চর্চা ও বিকাশের জায়গাগুলোকে অব্যাহতভাবে সমৃদ্ধ করতে হবে।'

আমি মনে করি, সরকার ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার জন্য যে লক্ষ্য নির্ধারণ করেছে, এর প্রাথমিক কাজগুলো সম্পন্ন হয়েছে। কিন্তু বড় মাপের কাজগুলো এখনও বাকি আছে। এর মধ্যে বড় মাপের কাজ বলতে দুটো কাজ চিহ্নিত করা যায়। এর একটি সরকারের নিজের ডিজিটালাইজেশন। অর্থাৎ সরকারি কাজগুলো সব ডিজিটাল পদ্ধতিতে হতে হবে। আরেকটি কাজ হচ্ছে শিক্ষার ডিজিটাল ট্রান্সফরমেশন। এ দুটো জায়গায় যদি ট্রান্সফরমেশন করা যায়, তাহলে ডিজিটাল বাংলাদেশের স্বপ্ন পূরণ হবে। ডিজিটাল ▸

বাংলাদেশ বিনির্মাণে আমাদের অগ্রগতি হয়েছে, কিন্তু চ্যালেঞ্জ অনেক বড়। এ দেশে চার কোটির মতো ছাত্রছাত্রী আছে। তাদের শিক্ষাব্যবস্থাকে ডিজিটাল করার জন্য সামগ্রিক পরিবর্তন যেমন– শিক্ষাদান পদ্ধতি, শিক্ষকের পরিবর্তন, পাঠক্রমের পরিবর্তন, পাঠদান পদ্ধতির পরিবর্তন এবং তাদের হাতে ডিজিটাল ডিভাইস পৌঁছানো এ ধরনের অনেক ব্যয়বহুল ও বিশাল কাজ করতে হবে। আর এটি সংশ্লিষ্টদের কাছেও একটি বড় চ্যালেঞ্জ। বিশেষ করে শিশুশ্রেণি থেকে উচ্চশিক্ষা পর্যন্ত ডিজিটালি পরিবর্তন আনা বড় চ্যালেঞ্জ। সরকার হাতির মতো। দ্রুত ঘুরতে পারে না। কিন্তু সরকারের এই রূপান্তরটাও দ্রুত করা দরকার। আমরা আরও লক্ষ করছি, এ সরকার সাত বছর পার করেছে। কিন্তু এখনও একটি মন্ত্রণালয় বলতে পারবে না যে আমরা কাগজ ছাড়া কাজ করি। কাজটা এত সহজে চুটকি বাজিয়ে করে ফেলার মতোও নয়। এ কথা ঠিক, কিছু ওয়েব পোর্টালের মাধ্যমে মানুষের সেবার জন্য কিছু তথ্য পৌঁছে দেয়া হচ্ছে। কিন্তু এর মাধ্যমে আমরা শুধু যাত্রা শুরু করেছি, যা পুরো কাজের একটি ক্ষুদ্র অংশ মাত্র। তথ্যপ্রযুক্তি ব্যবহারের ফলে প্রকৃতপক্ষে গোটা দুনিয়ার চিত্র বদলে গেছে। শ্রমবাজারেও এর পরিবর্তন এসেছে। শ্রমবাজার দুই ধরনের। একটি হচ্ছে কায়িক শ্রমনির্ভর, অন্যটি মেধানির্ভর। এতদিন ধরে আমাদের শ্রমবাজার ছিল কায়িক শ্রমনির্ভর। কিন্তু এখন প্রতিযোগিতায় টিকতে হলে আমাদের মেধাভিত্তিক শ্রমবাজারকে গুরুত্ব দিতে হবে। আর এজন্য আমাদের শ্রমশক্তিকে তথ্যপ্রযুক্তি বিষয়ে প্রশিক্ষিত করতে হবে।

দেশের সাইবার অপরাধ রোধে বেসিস কাজ করছে। বিশেষ করে এ ব্যাপারে ইন্টারনেট ব্যবহারকারীদের যেমন সচেতন হতে হবে, তেমনি আমরাও গ্রাহকদের সচেতনতা বাড়ানোর জন্য কাজ করছি। পাশাপাশি সরকারের সাইবার অপরাধ দমনে আইনগত ক্ষেত্রে সচেতনতা তৈরি করতে হবে। আমরা আশা করছি, সাইবার সিকিউরিটি আইন দ্রুত পাস হবে। কারণ আমাদের প্রযুক্তিগত সক্ষমতা সেভাবে তৈরি হয়নি। আমাদের ডিজিটাল সিকিউরিটির জন্য এ খাতে আরও অর্থ বরাদ্দ বাড়াতে হবে। আমাদের বুঝতে হবে, এখন লাঠি দিয়ে নয়, প্রযুক্তি দিয়ে অপরাধ দমন করতে হবে। এই প্রেক্ষিতে আমি রেজা সেলিমের মেইলটার কথা বলতে পারি। গত ৩০ জুন রেজা আমাকে মেইলটা পাঠায়। প্রিয় জব্বার ভাই, আজ সন্ধ্যায় আপনার সাক্ষাৎকার দেখছিলাম চ্যানেল ২৪-এ। তখন থেকেই ভাবছিলাম একটা লিখিত অভিনন্দন আপনাকে জানাই। একটু আগে এই খবরটি দেখে বুঝলাম বেসিস সভাপতির দায়িত্ব নেয়ার শুরুতেই আপনাকে কী রকম চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করতে হবে। আজ আপনি যা যা বলেছেন আর আমি জানি আপনি যা বিশ্বাস করেন এই চুক্তি তার সম্পূর্ণ বিপরীতে।

২০০৫ সালে আমি আই টি ইউর সাইবার ফেলো হিসেবে কিছুদিন দায়িত্ব পালন করেছিলাম। আমার অধ্যয়ন ও অভিজ্ঞতায় আমি বিশ্বাস করি, যদি আমাদের দেশে সঠিক নীতিমালা থাকে তাহলে তথ্যপ্রযুক্তির জগতে বর্তমানে দক্ষতার যে হারে আমরা পৌঁছাতে পেরেছি অন্তত ২০১৬ সালে এসে আমাদের বিদেশের (বা মাইক্রোসফটের) সাথে সাইবার নিরাপত্তা নিয়ে চুক্তি করার কোনোই দরকার নেই। এই যে ভুল প্রবণতা, তার জন্য আপনি আমাদের দেশের মৌলিক সফটওয়্যার উদ্ভাবন ও বিপণন নীতিমালা প্রণয়ন করে বাংলাদেশের তরুণ মেধাবীদের জন্য একটি মুক্তির পথ খুঁজে দেবেন আর তা আপনার নেতৃত্বেই সম্ভব বলে আমি বিশ্বাস করি। আপনি নিশ্চয়ই জানেন, ২০১০ সালে আমি আমাদের দেশের চারজন অতি তরুণ বিজ্ঞানীকে দিয়ে বাংলাদেশের প্রথম স্বাস্থ্য ডাটা সংরক্ষণের সফটওয়্যার তৈরি করিয়েছি, যা আমাদের গ্রাম ক্যান্সার ই-হেলথ কাজে ব্যবহার করা হচ্ছে। মাইক্রোসফট তখন এরকম কাজে তাদের সফটওয়্যার ব্যবহার করতে সে আমলে ২ মিলিয়ন ডলার চেয়েছিল। আমাদের করতে লেগেছিল ৩ লাখ টাকা। এই ডাটাবেজে এখন পর্যন্ত ১২ হাজার মহিলার প্রায় অর্ধকোটি উপাত্ত সংরক্ষিত আছে ও এই ডাটাবেজ সম্পূর্ণ নিরাপদ। এটা আমাদের নিজস্ব ব্যবস্থাপনায় চালু রয়েছে (ব্যক্তিগত স্বাস্থ্য তথ্য নিরাপত্তার কোনো আইন না থাকায় আমরা নিজেরাই একটা অভ্যন্তরীণ নীতি করে নিয়েছি)। এ ছাড়া ক্যান্সার চিকিৎসায় মোবাইল ফোনের বেশ কটি আন্তর্জাতিক মানের সেবা পদ্ধতি নির্মাণের কাজে আমরা প্রবাসী বাংলাদেশী প্রযুক্তিবিদদের সহায়তা নিয়েছি, যা খুবই অনুপ্রেরণামূলক।

আমি যেটুকু বুঝি, আমাদের দরকার– ০১. সফটওয়্যার তৈরি ও রফতানি বিপণনে সুনির্দিষ্ট নীতিমালা করে আমাদের সবগুলো দূতাবাসের কমার্শিয়াল শাখাকে সম্পৃক্ত করা; ০২. বিদেশে কর্মরত বাংলাদেশী প্রযুক্তি বিশেষজ্ঞদের অভ্যন্তরীণ কাজে সম্পৃক্ত করা; ০৩. দেশে নিয়মিত নিত্য নতুন কাজের জন্য ছেলেমেয়েদের উৎসাহিত করে দেশের ও বিদেশের বাজারে প্রবেশের সুযোগ করে দেয়া।

আপনি জানেন, বহুকাল আগে থেকেই আপনার কাজ ও নেতৃত্বের প্রতি আমার অসীম শ্রদ্ধা রয়েছে। আপনার যেকোনো কাজে বিন্দুমাত্র সহায়তার প্রয়োজন হলে আমাকে পাবেন। আপনার স্নেহধন্য রেজা সেলিম।

আমার ধারণা, পাঠকেরা রেজা সেলিমের বক্তব্য থেকে নিজেরা ধারণা করতে পারছেন কীভাবে আমরা ভুল পথে হাঁটি। আমরা দেশের ডিজিটালাইজেশনের জন্য যেভাবে ভুল পথে হাঁটি, সেটি ছেড়ে দেশের মেধা, দেশের সফটওয়্যার দিয়ে আসুন ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ি।

রেজা সেলিমের মেইলের পর দেশে আরও ঘটনা ঘটেছে। গুলশানের হলি আর্টিজান রেস্তোরাঁ এবং শোলাকিয়ার ঈদ জামাতের কাছে জঙ্গি হামলা হয়েছে। আমাদের সফটওয়্যার রফতানির ক্ষেত্রে এর নেতিবাচক প্রভাবও পড়েছে। কোন কোন বিদেশী ভাবছে আমরা জঙ্গি বানাই। সেজন্য জাপানে বেশ কিছু কাজে আমরা পিছিয়ে গেছি। দিনে দিনে তার রহস্য উন্মোচিত হচ্ছে। আমরা এখন এটি জানি, বাংলাদেশের সাম্প্রতিক জঙ্গি হামলায় জড়িতরা উচ্চশিক্ষিত এবং তারা প্রযুক্তিকে ব্যবহার করছে জঙ্গিবাদের প্রসারের জন্য। ডিজিটাল প্রযুক্তি ব্যবহার করার ফলে বিষয়টি আন্তর্জাতিকও হয়ে পড়েছে। আমি মনে করি, প্রযুক্তিগত অপরাধকে প্রধানত প্রযুক্তি দিয়েই মোকাবেলা করতে হবে। বেসিস মনে করে, বাংলাদেশ একটি ভাষারাষ্ট্র। এর জন্মের নীতি, আদর্শ ও লক্ষ্যকে ডিজিটাল প্রযুক্তি দিয়ে সারা দুনিয়ায় ছড়িয়ে দেয়া ও নতুন প্রজন্মকে দেশটির জন্মের অঙ্গীকারের সাথে সম্পৃক্ত করার ক্ষেত্রে আমাদের দায়িত্ব ও কর্তব্য রয়েছে। আমরা জঙ্গি চাই না, প্রোগ্রামার বানাতে চাই। আমাদের সন্তানদের মেধা বিপথে যেতে দিতে চাই না, ডিজিটাল যুগের কাজে লাগাতে চাই।

একই সাথে এই কথাটিও খুব স্পষ্ট করে বলতে চাই, আমাদের যেমনি করে জঙ্গি না বানিয়ে প্রোগ্রামার বানাতে হবে, তেমনি করে আমাদের নিজের দেশের ডিজিটাল রূপান্তরের কাজ আমাদেরকেই করতে হবে। আমরা কোনোভাবেই এটি ভাবতে চাই না যে বিদেশীরা এসে আমাদের সরকারের সেবা ডিজিটাল উপায়ে আমাদের জনগণের কাছে পৌঁছে দেবে। আমি এটা ভাবতে চাই না যে আমার দেশের অর্থ খাত, শিল্প-বাণিজ্য বিদেশীদের বানানো সফটওয়্যার দিয়ে পরিচালিত হবে। আমরা এটাও মনে করি না, আমার দেশের ডিজিটাল নিরাপত্তা বিদেশীরা দেবে। আমি সারা দুনিয়া থেকে প্রযুক্তি চাই, কিন্তু সেই প্রযুক্তির সবই বাংলাদেশের মানুষের কাছে হস্তান্তর হোক সেটি চাই। আমি দৃঢ়তার সাথে বিশ্বাস করি, আমাদের সন্তানেরা সব প্রযুক্তি ধারণ করার ক্ষমতা রাখে। কিন্তু যদি আমাদের দেশীয় প্রতিষ্ঠানকে দেশের কাজ করতেই দেয়া না হয় বা আমাদের শ্রেষ্ঠতম সফটওয়্যার থাকার পরেও শতগুণ দাম দিয়ে বিদেশ থেকে কেনা হয়, তবে আমাদের সফটওয়্যার বানাতে পারার কৃতিত্ব কার কাছে উপস্থাপন করতে পারব।

অন্যদিকে বিদেশীদের দিয়ে কাজ করিয়ে আমরা কেমন বিপন্ন হই, তারও কয়েকটি উদাহরণ তুলে ধরা যায়। বাংলাদেশে বিদেশী সফটওয়্যারের একটি বড় বাজার ব্যাংকিং সফটওয়্যারের। আমরা জেনেছি, বিদেশী সফটওয়্যারগুলো অনেক দাম দিয়ে কেনার পর সেগুলোকে এখন দেশের রীতি-নীতি ও প্রয়োজন অনুসারে কাস্টমাইজ করা কঠিন হয়ে পড়েছে। এজেন্ট ব্যাংকিং বা ইসলামী ব্যাংকিংয়ের মতো নতুন সেবার জন্য বিদেশী সফটওয়্যারগুলো এখন হিমশিম খাচ্ছে। যদিও এসব সফটওয়্যার কখনও কখনও শতগুণ টাকা দিয়ে কেনা হয়েছে, তথাপি সেগুলো দেশীয় সফটওয়্যারের সমতুল্য নয়।

আমাদের অনেক বিশেষজ্ঞ মনে করেন, বিদেশীদের সাথে কাজ করানোর সময় দেশীয় প্রতিষ্ঠানগুলোকে যুক্ত না করলে বিদেশীরা বিদায় নেয়ার পর প্রতিষ্ঠনটি বিপন্ন বা জিম্মি হয়ে পড়ে। বাংলাদেশ ব্যাংকের সাম্প্রতিক রিজার্ভ চুরির জন্য কেউ কেউ শুধু বিদেশ নির্ভরতাকেই দায়ী করেন। যেসব ছোটখাটো কারণে রিজার্ভ চুরি সহজ হয়েছে, কোনো দেশীয় প্রতিষ্ঠানের সাথে যুক্ত থাকলে সেসব নাও থাকতে পারত বলে মনে করা হয়। বস্তুত বিদেশী প্রতিষ্ঠানটির কথা ছিল তাদের কাজ শেষ হওয়ার পর কোনো দেশীয় প্রতিষ্ঠানকে তারা কাজটি বুঝিয়ে দেবে। বাংলাদেশ ব্যাংক সেটি করেনি। ▶

আমি বিদেশী প্রতিষ্ঠানকে দিয়ে কাজ করিয়ে জিম্মি হওয়ার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার কথা বলতে পারি। বাংলাদেশের মেশিন রিডেবল পাসপোর্ট একটি বিদেশী প্রতিষ্ঠান করেছে। এরা ৯ ডিজিটের ডাটাকে ১০ ডিজিট করার সময় মিলিয়ন ডলার বাড়তি দাবি করেছিল। এমনকি এরা এদের সফটওয়্যারের সোর্স কোড দেয়নি। ফলে এখন একটি পাসপোর্টের ব্যাক অ্যান্ড প্রসেসিং করতে কমপক্ষে ৬ ঘণ্টা সময় লাগে। এই সময় কমিয়ে আনার ক্ষমতা কর্তৃপক্ষের নেই। যদি সেটি করতে হয়, তবে ডাটাবেজটি নতুন করে তৈরি করতে হবে।

অনেকেই জানতে চেয়েছেন, কেন আমাদের দেশীয় প্রতিষ্ঠানগুলো এসব কাজ করতে পারে না। এর জবাবটা হচ্ছে, বিশেষত বড় ধরনের কাজ ও বিদেশীদের অর্থায়নের কাজে টেন্ডারে এমন সব শর্ত দেয়া থাকে, যা দেশীয় প্রতিষ্ঠানগুলোর পক্ষে পূরণ করা সম্ভব হয় না। আমাদের দেশীয় প্রতিষ্ঠানগুলোর বড় ধরনের কাজ করার সক্ষমতারও ঘাটতি রয়েছে। সরকারের ক্রয় আইন সংশোধন করে তাতে দেশীয় প্রতিষ্ঠানগুলোর অংশ নেয়ার পথ তৈরি করা যেতে পারে। বিদেশী প্রতিষ্ঠানগুলোকে বাধ্যতামূলকভাবে দেশীয় প্রতিষ্ঠানের সাথে যৌথভবে কাজ করতে দেয়া যেতে পারে। বিদেশীরা বিদায় নেয়ার সময় তারা যেন কাজটি দেশীয় প্রতিষ্ঠানকে বুঝিয়ে দেয়, তারও শর্ত থাকতে পারে।

আমরা লক্ষ করেছি, সরকারি প্রতিষ্ঠানগুলো শত শত ডলারের বিদেশী সফটওয়্যার লাইসেন্সসহ কিনতে চাইলেও দেশী সফটওয়্যারের পাইরেটেড সংস্করণ সরবরাহ করতে আদেশ দেয়। মাইক্রোসফট ওয়ার্ড শেখানোর জন্যও আমরা বিদেশী প্রতিষ্ঠানকে ডেকে আনি। আমাদের হিসাব– সফটওয়্যারের বাজারও বিদেশীরা দখল করার চেষ্টা করছে। শুধু বাংলা সফটওয়্যার ছাড়া বাকি সবই ওরা হাতিয়ে নিতে চায়।

আমি দৃঢ়তার সাথে বিশ্বাস করি, বাংলাদেশের তথ্যপ্রযুক্তি বাজার ইউরোপের বাজারের চেয়ে অনেক বড়। নিজেরা যদি নিজেদের দেশের কাজ করতে পারি, তবে আমাদের শিক্ষিত বেকারের বিশাল অংশকে কাজে নিযুক্ত করতে পারি। এর ফলে দেশে বিশাল আকারের তথ্যপ্রযুক্তি প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠতে পারে। খুব সম্প্রতি আমি বিজনেস প্রসেস আউটসোর্সিং ও কলসেন্টার সমিতির সভাপতি আহমেদুল হকের সাথে কথা বলেছি। তিনি খুব স্পষ্ট করে বলেছেন, তাদের কাজের শতকরা ৯৫ ভাগ বাংলদেশের এবং গত বছর তাদের কাজ দ্বিগুণ বেড়েছে। তাদের কাজের জন্য কমপিউটার বিজ্ঞানের ছাত্রও দরকার নেই, সাধারণ ছেলেমেয়েরাই এসব কাজ করতে পারে। তাদের কাজ শতকরা ৭৫ জন মেয়েই করতে পারে। আরও মজার ব্যাপার, তাদের কাজের শতকরা ৯৫ ভাগের জন্য বাংলা ভাষার প্রয়োজন এবং সেটিও তারা পায় না।

সফটওয়্যারের বাজারটা দারুণভাবে বাংলাদেশনির্ভর। দেশের সব ব্যবসায়-বাণিজ্য-শিল্প-কলকারখানার কথা ভাবলে আমরা শিহরিত হতে পারি। অন্যদিকে আমাদের জনসংখ্যার শতকরা ৪০ ভাগ লোককে শুধু সরকারি খাতের ডিজিটালাইজেশনের কাজে লাগানো যেতে পারে। চীন এক সময়ে বিদেশী কাজের জন্য ব্যস্ত থাকত। কিন্তু চীনকে এখন শুধু নিজের দেশের দিকেই তাকাতে হচ্ছে, বিদেশী কাজের কথা তারা ভাবতেই পারে না। আমাদের সুবিধাটি হচ্ছে, জনসংখ্যার কর্মক্ষম মানুষ বেশি বলে আমরা দেশের ও বাইরের উভয় ধরনের কাজই করতে পারব। তবে এটি বাস্তবতা যে, আমাদের নিজের দক্ষতা নিজেদের ঘরেই প্রমাণ করতে হবে। আমরা বিশ্বাস করি, এই সফলতা আমাদের আসবেই। মনে রাখা দরকার, আমরা সেই প্রধানমন্ত্রীর দেশে বাস করি, যিনি ডিজিটাল ডিভাইস আমদানিকারকের দেশ থেকে রফতানিকারক দেশে পরিণত হতে চান এবং যিনি বিশ্বব্যাংককে বলে দিতে পারেন, তোমরা চলে যাও আমাদের সেতু আমরা বানাব। আমরা আস্থা রাখতে পারি যে তিনি এই কথাটি বলবেন, আমাদের ডিজিটাল রূপান্তর আমরাই করব। আমাদের সন্তানদের সফটওয়্যার ও সেবায়ই ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ে উঠবে। ওরাই আমাদের ডিজিটাল বাংলাদেশের সৈনিক কজ

ফিডব্যাক : mustafajabbar@gmail.com

ডাটা সায়েন্সে বিজ্ঞানটা কোথায়?

(৩৩ পৃষ্ঠার পর)

হতে চান বিশেষজ্ঞ : ডাটা বিজ্ঞানীরা কাজ করতে পারেন বিভিন্ন ধরনের ইন্ডাস্ট্রিতে– হেলথকেয়ার, ফিন্যান্স, এনার্জি, ট্রান্সপোর্টেশন, এবং আরও অনেক। আপনি যে ইন্ডাস্ট্রিতে কাজ করতে আগ্রহী, সে ইন্ডাস্ট্রির ভেতর-বাইর ভালো করে জানুন, অর্জন করুন ডোমেইন নলেজ। শাম মোস্তাফা বলেন– 'একজন বড়মাপের ডাটা বিজ্ঞানীর থাকে ব্যাপকভিত্তিক ডোমেইন নলেজ। কখনও কখনও ডোমেইন নলেজ সহায়ক হয় উন্নততর প্রিডিক্টিভ মডেল তৈরি করতে। যথার্থ সঠিকভাবে ডাটা ব্যাখ্যা করতে ডোমেইন নলেজ সহায়ক।'

০৫. ডাটা সায়েন্স ইমারসিভ প্রোগ্রামে যোগ দেয়ার বিষয়টি বিবেচনায় রাখুন : আমাদের সবার মাঝে কলেজে ফিরে যাওয়া কিংবা মাস্টার্স ডিগ্রি অর্জন করার মতো বিলাসিতা কাজ করে না। ডাটা সায়েন্সে ট্রানজিশনের একটি উপায় হচ্ছে, ইমারসিভ প্রোগ্রামে যোগ দেয়া। ইমারসিভ প্রোগ্রাম হচ্ছে দ্বিতীয় আরেকটি ল্যাঙ্গুয়েজ শেখার প্রোগ্রাম।

ডাটা সায়েন্স শুধু ডাটা বিজ্ঞানীদের জন্য নয়

আজকে আমরা জানি, ডাটা সায়েন্স শুধু ডাটা সায়েন্টিস্টদের জন্য নয়। ইন্টারনেট অব থিংস, বিগ ডাটা অ্যানালাইটিক ও মেশিন-লার্নিংয়ে আমাদের ক্রমবর্ধমান ব্যবসায়-কেন্দ্রিক উদ্যোগে কমপক্ষে এটিই হচ্ছে দৃশ্যমান প্রবণতা। নতুন ডাটা-অ্যাওয়ার বোর্ডরুম দেখছে এমনকি সিইও ও সিএফওরাও ডাটা হেলথের ব্যাপারেও চাইছেন

বাজার সচেতনতা ও স্মার্ট ডাটা ডিসকভারির অ্যাডাপশন ব্যাপক ধরনের ব্যবহারকারীর কাছে ডাটা সায়েন্সকে সম্প্রসারিত করবে, বাড়িয়ে তুলবে অ্যানালাইটিকের প্রভাব

সূত্র: ক্লিয়ারস্টোরি ডাটা

আইটি ফাংশন। গড়পড়তা ওয়ার্ল্ড ফিউচারিস্ট অথবা সোসাইটি-ডেভেলপমেন্ট কনফারেন্সের দিকে নজর দিন, এটা দেখা অস্বাভাবিক নয় যে, সেখানে অধিবেশন হচ্ছে আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স, রোবটিকস ও ডাটা লার্নিং নিয়ে।

০৬. ডাটা রেংলিং, কাউবয় স্টাইল : ব্যবসায়ী-রা এখন জানতে চান, তাদের প্রতিষ্ঠান কতটুকু ভালোভাবে ডাটা প্রসেস করছে। এমনকি যদিও এরা জানতে চায় না, এই টুলের পেছনের মেকানিকস এএলএল (অ্যাসোসিয়েশন অব ল্যাঙ্গুয়েজ লার্নিং) সম্পর্কে। মোটের ওপর এ ক্ষেত্রে কার্যকর প্রযুক্তির (ফাংশনাল টেকনোলজির) মধ্যে বেশিরভাগই হচ্ছে অটোমেশন সফটওয়্যারের বা টুলের খণ্ডাংশ। এই ডাটা অ্যানালাইসিসের উদ্যোগে কোনো না কোনোভাবে বর্ণনা করা হয় সেই পদ্ধতি, যা প্রয়োগ করা হয় 'ক্লিয়ারস্টোরি ডাটা'য়। এই প্রতিষ্ঠান বলে তথাকথিত ডাটা ইনফারেন্সের কথা এবং এটি কোনো না কোনো উপায়ে 'ইন্টেলিজেন্ট ডাটা হারমোনাইজেশন' পদবাচ্যটির ট্রেডমার্ক তৈরি করতে সক্ষম হয়েছে। এখানে আমরা 'ইনফাইনিট ডাটা ওভারলেপ ডিটেকশন' নামের আরেক টুকরো টেকনোলজি পাই, যার অভ্যন্তরীণ কোডনেম হচ্ছে আইডিওডি। এটি একটি স্পার্কভিত্তিক অ্যানালাইটিকস প্রোডাক্ট, যা প্রতিটি সোর্সে ডাটা প্যাটার্ন ও কাস্টমার-স্পেসিফিক ডাটা টাইপ চিহ্নিত করতে সক্ষম বলে দাবি করে। এখানে একজন ব্যবহারকারী সংশ্লিষ্ট হয় একটি অ্যানালাইসিসের অংশ হিসেবে কজ